# মাতৃত্ব

## যুথিকা বড়ুয়া

### ( এক )

সারাদিনের কর্মক্লান্তিতে কখন যে তন্দ্রা লেগে এসেছিল, টেরই পায়নি গৌরী রানি। হঠাৎ বাসন-পত্রের টুং টাং শব্দে ধড়ফড়ু করে ওঠে। মুহূর্তের জন্য স্বপ্ন না বাস্তব, ঠাহরই করতে পাচ্ছিল না। চোখ পাকিয়ে দ্যাখে চারিদিকে। কান পেতে শোনে। ততক্ষণে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে বাবলু। কতই বা আর বয়স ওর, বছর আটেকের হবে। মায়ের অজান্তে রান্নাঘরে ঢুকে এই কান্ড।

ছোটবেলা থেকেই ক্ষীর মিঠাই, পিঠা-পায়েশ খুব প্রিয় বাবলুর। সকালে খেয়ে ওর মন ভরেনি। বাটিটাই দেখতে বড় ছিল। কিন্তু গৌরী রানি দিয়েছিল নামমাত্র। ঐটুকু খেয়ে তৃপ্তি হয় কারো! পেটের এককোণাও ভরেনি বাবলুর। অপেক্ষায় ছিল, মা অন্যমনস্ক হলেই চুপিচুপি রান্নাঘরে ঢুকে ইচ্ছেমত ক্ষীর খাবে। অথচ তেমন সাহসী বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর ছেলে ও' নয়। মা জানতে পারলে উত্তম মধ্যম যে পিঠে পড়বে, তাও বেশ ভাল করেই জানা ছিল। কিন্তু অবোধ নাবালকের মন, অতখানি ভেবে দেখার ফুরসৎ কোথায়! পাড়ার লালটুর সাথে মারবেল খেলায় এতো মত্ত হয়েছিল, রান্নাঘরের বারান্দায় ডালের বড়ি শুকোচ্ছিল, হঠাৎ কাঁক এসে ঠোঁকর দিতেই গৌরী রানির বজ্রকণ্ঠে চমকে ওঠে। -"ছ্যামড়া তুই করস কি ঐখানে! আমার এতো সাধের বড়িগুলারে মরার কাঁকে মুখ দিল, চোখে দ্যাখস নাই!"

গজ গজ করতে করতে বড়িগুলোকে পাহাড়া দিতে গৌরী রানি মাদুর পেতে শুয়ে পড়ে বারান্দায়। বাবলুর অবগত আছে যে, মায়ের বিশ্রাম নেওয়া মানেই এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বে। মনে মনে পরিকল্পনা করে, মায়ের চোখদু'টো বুজে এলেই পিছন দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়বে। আর ঠিক তক্ষুণিই দৌড়ে পা টিপে নৈঃশব্দে রান্নাঘরে ঢুকে, দরজা বন্ধ করে ক্ষীরের পাতিলাটাই নিয়ে বসেছিল খেতে। কিন্তু বেচারা একটুও মুখে দিতে পারে নি। সবে মাত্র আঙ্গুল ডুবিয়েছে, তক্ষুণি জানালার ধারে বসে থাকা হুঁলো বিড়ালটা মিঁয়াউ করে ডাক দিতেই বাবলু চমকে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরের পাতিলাটা ওর হাত থেকে ছিটকে পড়ে বাসন-পত্রের ওপর। বাবলু স্বগতোক্তি করে ওঠে,-"সর্বণাশ, এতোগুলি ক্ষীর, পাতিলা শুদ্ধু সব পড়ে গেল মাটিতে! কি হবে এখন!"

কিন্তু হবার কি আর অপেক্ষায় থাকে! ততক্ষণে একটা লেগে তিনটে পড়ে। পড়তে পড়তে বাসন-পত্রের টুং টাং শব্দের প্রতিঃধ্বনিতে কানে একেবারে তালা লাগার উপক্রম। সব হুড়মুড় করে বাবলুর পায়ের ওপরেই পড়ে। কি অসহ্য যন্ত্রণা! বাবলু চিৎকার করে ওঠে,-"ও মা গো মা, শীগগির এসো! পা-খানা আমার ভেঙ্গে গেল গো!"

শুধু কি যন্ত্রণা, মায়ের শ্বরণাপন্ন হতেই ভয়-ভীতিতে বাবলু একেবারে আড়ষ্ঠ হয়ে যায়। থর্ থর্ করে হাত-পা কাঁপতে শুরু করে। গলা শুকিয়ে আসে। দৌড়ে রান্নাঘর থেকে পালাবে, সে শক্তিও নেই! বড্ড লেগেছে পায়ে। তবু খাওয়ার লোভ সামলাতে পারে না। সারা মুখে, আঙ্গুলের ডগায় যেটুকু ক্ষীর লেগেছিল, দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে সেটুকুই চেটে চেটে খায় আর ভাবে,-"মায়ের হাত থেকে আজ আর রক্ষা নেই! কপালে ওর দুঃখ অনিবার্য!"

ক্ষীরের গন্ধ্যে ছেয়ে গিয়েছে সারাঘর। পা ফেলবার জায়গাই নেই। মুহূর্তেই একঝাঁক মাছি এসে রান্নাঘরের চারিদিকে বোঁ বোঁ করে উড়ছে। বাবলুর চোখে মুখেও খানিকটা ছিটকে পড়েছে। অদ্ভুত লাগছে দেখতে। মনে হচ্ছে, ক্ষীরের পাতিলা থেকে বাবলু ডুব দিয়ে উঠেছে। আর ওর ঐ বীভৎস চেহারার দর্শণে সাংঘাতিক চটে যায় গৌরী রানি। রেগে একেবারে আগুন। বাবলুর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে অনায়াসেই বুঝতে পারে, ও' ক্ষীর চুরি করে খেতেই ঢুকেছিল রান্নাঘরে। হাতের সামনে একটা ঝাঁটা ছিল। চোখমুখ রাঙিয়ে সেটা নিয়েই তেড়ে আসে। গলার স্বর বিকৃতি করে বলে,-"বেয়াদপ, রাক্ষশ কোথাকার! তড় এত্তবড় সাহস!"

বলতে বলতে ঝাঁটা দিয়ে দমাদম পিটাতে শুরু করে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে বাবলু। মায়ের পা-দু'টো জড়িয়ে ধরে বলে,-"মা, মাগো, আমায় মেরনা মা, মের না! আর কক্ষনো করবো না মা! আর কোনদিনও করবো না!"

পাষাণ হৃদয় গৌরী রানির। সহজে গলার নয়। শাড়ির আঁচলটা কোমড়ে গুঁজতে গুঁজতে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে,-"হইছে হইছে, পা-খান্ ছাড় আমার! তড়ে না আমি বাটি ভইর‍্যা দিছিলাম! খাইয়া প্যাট ভরে নাই! বাসনগুলারে তো সব দিছস ফ্যালাইয়া! আমার কাম একখান্ বাড়াই রাখছস! পাইছস কি আমারে! এত্তো জ্বালাশ ক্যান, কয়?"

বাবলুর কানদু'টো খুব জোরে মুলে দিয়ে বলে,-"হারামজাদা, তলে তলে তড় এত্ত বুদ্ধি! ব্যাটা চুরি বিদ্যাও শিখছ, এ্যাঁ! আবার দেখি রান্নাঘরে, তড় ঠ্যাং-আমি ভাইঙ্গা দিমু! আউক তড় বাপ! এর একখান্ বিহিত আজ করতেই হইব!"
বলে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে হিংস্র বাঘিনীর মতো কটাক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। চোখ দিয়ে যেন আগুনের গরম শলাকা বের হচ্ছে। যেন গিলেই খেয়ে ফেলবে বাবলুকে!

ইতিমধ্যে বাবলুর বাবা শশী ভূষণের গলা শোনা গেল। তিনি হলেন আরেক জগতের মানুষ। প্রচন্ড মাছ ধরার বাতিক। একরকম নেশাও বলা যায়। ছুটির দিনে বাড়িতে দর্শণই পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে প্রতিদিন মায়ে-পুতের পাঁচালী শুনতে শুনতে তার বিরক্তি ধরে গেছে। সাত সকালেই ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ছিলেন মাছ ধরতে। পড়ন্ত বিকেলে ফিরে এসে হাঁক ডাক দিয়ে বললেন,-"কোইগো ছোট গিন্নী, কোই গ্যালা! আইশ্যা ধরো শীগ্‌গির! আজ একখান পদ্মার ইলিশ আনছি!"

স্বামীর আওয়াজ কর্ণগোচর হতেই রক্তের চাপ যেন আরো দশডিগ্রী বেড়ে গেল গৌরী রানির। রাগে মুখের পেশীগুলি ফুলে লাল হয়ে ওঠে। সবুর সয় না। ঝাঁটা হাতেই উত্তপ্ত মেজাজে হন্‌হন্ করে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। হাঁপাতে হাঁপাতে অভিযোগ করে ছেলের বিরুদ্ধে।-"ওগো, শুনছো! তোমার গুনধর পুত্রুর কি করসে দেইখ্যা যাও! আমার হাঁড়-মাংস এক্কারে চিবাইয়া খাইতাছে! আমি আর পারুম না! আমার সহ্য হইতেছে না! অড় শীগ্‌গির একখান্ ব্যবস্থা কড়!"

শুনে থ্ হয়ে যায় শশী ভূষণ। বিস্ময়ে হাঁ করে থাকে। গিন্নীর আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে বললেন,-"এ তুমি কি কইলা ছোট গিন্নী! পোলাপাইন মানুষ, জ্ঞান-বুদ্ধিও হয় নাই! দোষ তো করবই! তুমি না অড় মা! অড়ে

শাসন করো! তুমিই তো কইছিলা, অড়ে দ্যাখবা, মানুষ করবা! হেই ভড়সায় তো তোমারে আনছি! নিজের প্যাটের সন্তান হইলে কি আর একথা কইতে পারতা! বুঝি না বাপু, কও কেন্নে? অন্তরে কি মায়া-দয়াও নাই তোমার?"

ফোঁস করে ওঠে গৌরী রানি।-"অ, এইবার বুজ্বি! হ্যাড় লাইগ্যাই তো চাইর চাইরটা বছর গত হইল গিয়া, আমারে আজও একখান সন্তান দিলা না! উল্টা বাপ-ব্যাটায় দুজনে মিল্ল্যা আমারেই জব্দ কড়! পোলারে তো আস্কারা দিয়া এক্কারে মাথায় তুইল্যা রাখছ! আমারে মাইনব ক্যান! হক্ কথা কই দেইখ্যাই তোমাগো জ্বলন ধরছে! আমি কি বুঝি না কিছু!"

বলে স্বামীর হাত থেকে ঝট্ করে মাছের ব্যাগটা টেনে নিয়ে উগ্র মেজাজে গজ্‌গজ্ করতে করতে দ্রুত ঢুকে পড়ে রান্নাঘরে।

শশী ভূষণ বরাবরই শান্তি প্রিয় মানুষ। কোনরকম ঝামেলা, অশান্তি তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। সর্বদাই এড়িয়ে চলেন। গায়ে মাখান না। কিন্তু আজ হঠাৎ অপ্রত্যাশিত গিন্নীর অশোভনীয় বাক্যে হতাশায় মোমের মতো গলে একদম নরম হয়ে গেলেন। একটি শব্দও আর উচ্চারণ করলেন না। অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন বারান্দায়।

ইত্যবসরে বাবলু দৌড়ে গোয়ালঘরের পিছন দিকে চলে গিয়েছিল। আড়ি পেতে মা-বাবার কথা শুনছিল বসে বসে। কিন্তু মগজে না ঢুকলেও আলোচ্যের বিষয় বস্তু কিঞ্চিৎ বোধগম্য হতেই ভারাক্রান্ত মনে চুপটি করে বসে পড়ে মাটিতে। বেচারার অনুতাপের আর শেষ নেই। নিজের ওপরই প্রচন্ড রাগ হয়। ধ্যাৎ, কোন্ কুক্ষণে যে রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে ছিল, মরার বিড়ালটাও মিঁয়াউ করবার আর সময় পায়নি। তাও যদি একটু তৃপ্তি ভরে খেতে পারত। সব মাটিতেই পড়ে গেল! উফ্, মাগো!

হঠাৎ পায়ের পাতায় প্রচন্ড যন্ত্রণা অনুভব করে বাবলু। বড্ড কষ্ট হচ্ছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পাচ্ছে না। এক সময় মনটা ওর উদাস হয়ে যায়। হাজার প্রশ্নের ভীড় জমে ওঠে। নিশ্চয়ই মা আমায় ভালোবাসে না। তাই তো বুকে জড়িয়ে ধরে কক্ষনো আদর করে না, চুমু দেয় না! কিন্তু কেন? পাশের বাড়ির খোকনকে তো ওর মা কত আদর করে, ভালোবাসে! ওকি কখনো অন্যায় করে না?
সেদিন মুরগির বাচ্চাগুলিকে ফার্ম থেকে ছেড়ে দিয়ে সেই কি কান্ড! একটাকেও বাঁচাতে পারে নি। সবগুলিই গেছে কাঁকের পেটে। ঠোঁট দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। কোই, খোকনকে তো মারধোর করে নি ওর মা! রাগারাগিও করে নি!

বাবা বলে,-"পৃথিবীতে মায়ের চে' বড় আর কেউ নেই! মায়ের স্থান কেউ পূরণ করতে পারে না! আপনগর্ভে লালিত সন্তান আর মায়ের নারীর চিরন্তন বন্ধন, সে এক অদৃশ্য শক্তি, এক অবিচ্ছেদ্য গভীর টান। তাকে ছিন্ন করা, মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। স্বয়ং বিধাতারও নেই! মাতা-পিতা দেব-দেবীর সমতূল্য!"
তা'হলে আমার মায়ের মন কেন এতো নিষ্ঠুর? কেন এমনভাবে আমায় আঘাত করে? খাবার জিনিস মায়ের অনুমতি ছাড়া খেতে গিয়ে সব পড়ে গিয়েছে মাটিতে। এতে এমন কি গুরুতরো অপরাধ করে ফেলেছি যে, মা আমায় সহ্যই করতে পারছে না! আমি কি মায়ের সন্তান নই!

ভাবতেই মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল বাবলুর। শরীরটাও ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে, গোটা পৃথিবীটাই যেন বন্ বন্ করে ঘুরছে চারদিকে। অথচ মা-বাবা কাউকে ডাকলো না। দু'চোখ বন্ধ করে বাঁশের খুঁটিতে মাথাটা ঠেকান দিয়ে চুপটি করে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে।

ততক্ষণে ক্লান্ত সূর্য্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। পশ্চিমপ্রান্তে নিস্তেজ সূর্য্যের ক্ষীণ আলোর আভা মুখের উপর এসে পড়তেই শশী ভূষণ উঠে দাঁড়ান। বেচারা স্ত্রী-পুত্রের ভবিতব্য রচনা করতে করতে সেই তখন থেকে অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিলেন। ইতিপূর্বে চালের ওপর থেকে একটা টিকটিকি গায়ের উপর ঝাঁপটে পড়তেই চমকে ওঠেন।-"হেই হট্, হট্! অ বাবলু, বাবলু! কোই গেলি বাবা তুই! শীগগির আয় দেখি নি!"

ধারণা করে ছিলেন, নিশ্চয়ই ভয়ে ঘরের ভিতর লুকিয়ে আছে বাবলু। কিন্তু কোথায়! সাড়া-শব্দই নেই ওর। শশী ভূষণ ঘাঁড় ঘুরিয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতেই নজর পড়ে গোয়ালঘরের দিকে। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন,-" ঐখানে করস কি তুই বাবলু?"

বলতে বলতে দ্রুত এগিয়ে আসেন। বাবলুর গায়ে একটা ঝাঁকা দিয়ে বলেলন,-"অ বাবলু, ঘুমায় পড়ছস! বাবা দাঁড়াই দাঁড়াই ঘুমাশ ক্যান! মায়ে মারছে বুঝি খুব!"

পিতার আলতো স্নেহস্পর্শে ঈষৎ নড়ে ওঠে বাবলু। ওর কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে শশী ভূষণ বললেন, - "হ্যারে, করছস কি তুই! এত্ত করে কইলাম, চল আমার লগে! গেরাহ্যই করলি না! তড় গা-হাত-পা এত্ত নোংরা ক্যান? সাদা সাদা এগুলা কি? কি মাখছস?"

চোখ মেলে তাকায় বাবলু। কিছু বলল না। গোমড়া মুখে এক পলক চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। শশী ভূষণ বুঝলেন, বাবলু অভিমান করেছে, গোস্যা করেছে। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,-"চল বাবা, ঘরে চল! ইলিশ মাছ আনছি। মায়ে রানতাছে। গরম গরম ভাত দিয়া দুইটা খাবি চল!"

বাবলু নিরুত্তর। পদাঘাতে থপ্থপ্ শব্দ করে এগিয়ে যায় পুকুরঘাটের দিকে। মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়। শশী ভূষণ আর্তকণ্ঠে বললেন,-"কোথায় যাস বাবলু! মায়ে মাইর দিব কিন্তু!"

( দুই)

বেশ কিছুদিন যাবৎই বাবলুর ব্যতিক্রম পরিবর্তন দেখা দেয়। স্কুল থেকে এসে বারান্দার কোণে বিষন্ন মুখে চুপটি করে বসে থাকে। কারো সাথে কথা বলে না। সময় মতো নাওয়া-খাওয়া করে না। খেলতেও যায় না মাঠে। বিকেল হলেই ওর সঙ্গী-সাথিরা বাড়ির সামনে এসে ভীঁড় জমায়। দূর থেকে উঁকি ঝুঁকি মারে। কিন্তু বজ্রকণ্ঠি গৌরী রানির ভয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করার সাহসই হয় না কারো। কেউ কেউ কানাকানি করে, মুখ টিপে হাসে। আর কেউ ব্যঙ্গ করে বলে,-"কি রে বাবলু, তোকে আজ খুব পিটিয়েছে বুঝি তোর মা!"

ইতিপূর্বে বারান্দায় বেরিয়ে আসে গৌরী রানি। চোখমুখ রাঙিয়ে কটাক্ষ করে বলে,-"বান্দর পোলাপাইন কতগুলা! তগোর দরদ এক্কারে উথলে উঠতাছে, না! দাঁড়া, তগোরে দেখাই মজা!"

বলে হনহন করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে উঠোনে। ততক্ষণে ছেলে-মেয়েরা হৈ-হুল্লোড় করতে করতে ছুটে পালায়। কিন্তু বাবলু গোঁ ধরে ঠাঁয় বসে থাকে। মন্ত্রের মতো শুধু জপতে থাকে, মায়ের সাথে কোনদিনও আর কথা বলবে না।

বলিহারী মহিলা গৌরী রানি। গ্রাহ্যই করল না। অকারণে মুখখানা বিকৃতি করে হন্ হন্ করে গোয়ালঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কোণা চোখে বাবলুকে দেখলো, কিন্তু কিচ্ছু বলল না।

মনে মনে অবাক হয় বাবলু। বোবার মতো শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। আশা করেছিল, মা কাছে আসবে, মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে আদর করবে। স্নেহভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করবে,-"হ্যাঁ রে বাবলু, মায়ে মারছিল, খুব ব্যথা পাইছিলি না রে! আহা, বাছা আমার! আয় বাবা আয়, আমার বুকে আয়! আর কক্ষনো মারুম না!"

কিন্তু কোই, মা তো কিছুই বলল না! তবে কি সত্যিই মা আমায় ভালোবাসে না?

তুব নিস্পাপ নাবালকের মন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, সন্তানের প্রতি মা কখনো এতোখানি নির্দয় নিষ্ঠুর হতে পারে না। মায়ের অবাধ্য হয়েছি বলেই মা রেগে গিয়েছে! রাত পোহালে নিশ্চয়ই সব ভুলে যাবে মা!

এই ভেবে বাবলু উঠে দাঁড়ায়। মায়ের উপর সমস্ত মান-অভিমান মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। ততক্ষণে সন্ধ্যে ঢলে পড়েছে। প্রতিদিনকার মতো মুখ-হাত-পা ধুয়ে পড়তে বসে। আর বাবলুর পড়া মানেই ফুটবল খেলার রিলে করার মতো। দাঁড়ি নেই, কমা নেই, বিরতি নেই। এক নাগারে কান তালা লাগিয়ে সজোরে পড়তে পড়তে ক্লান্ত দেহের অবসন্নতায় কখন থেকে যে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, টের পায় নি। হঠাৎ ঘড়ির ঘন্টা শুনে চমকে ওঠে। চোখ মেলে দ্যাখে, রাত প্রায় এগারোটা বাজে। বইপত্রর সব বিছানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মা-বাবার কারো সাড়া-শব্দ নেই। ভাবল, নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধীর পায়ে বিছানা ছেড়ে নেমে আসে বাবলু। নৈঃশব্দে দরজা খুলে গলা টেনে রান্নাঘরের দিকে চেয়ে দ্যাখে, দরজা বন্ধ, অন্ধকার। কিন্তু মায়ের ঘরের জানালা দিয়ে ঈষৎ আলোর রশ্মি এসে পড়েছে বারান্দায়। এদিকে ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। সেই দূপুর থেকে কিছুই আর খাওয়া হয় নি। মাকে ডাকাডাকি করলে হয়ত এক্ষুণিই চেঁচামিচি শুরু করে দেবে।
এই ভেবে বাবলু নিজেই পা টিপে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতেই থমকে দাঁড়ায়। মনে হলো, ওর সম্বন্ধেই খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মা-বাবা আলোচনা করছে। কিন্তু কেন? ওতো আজ কোনো অন্যায়, অপরাধ করে নি! মায়ের কোনো অনিষ্ঠ করে নি! তা'হলে!

হঠাৎ কৌতূহল জেগে ওঠে। গিয়ে উঁকি দেয় জানালায়। শোনে আড়ি পেতে। আর শোনামাত্রই থ্ হয়ে যায় বিস্ময়ে। ও' যেন আকাশ থেকে পড়ল। কিছুতেই ওর বিশ্বাস হয় না। আজ এ কি শুনলো ও'!
মনে মনে বিড় বিড় করে ওঠে। এসব কি বলছে মা? মা যা বলছে সত্যিই কি তাই? আমি ওর ছেলে নই? না, না, এ হতে পারে না! এ কেমন করে সম্ভব! নিশ্চয়ই ও' ভুল শুনেছে!

না, ভুল নয়! ঠিকই শুনেছে বাবলু। হাত নেড়ে গৌরী রানি চিৎকার করে বলছে,-"অড়ে আমি দেখুম ক্যান? ক্যান দেখুম? হে তো আমার পোলা নয়! আমি তো অড়ে প্যাটে ধরি নাই, অড়ে জনম দেই নাই! হে আমার

পোলা হইল ক্যাম্নে? বান্দর একখান্! খালি ল্যাজটাই দেয় নাই ভগবানে! অড়ে কক্ষনোই স্বীকার করুম না! এই আমার শ্যাষ কথা!"

হঠাৎ যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। চমকে উঠল গৌরী রানি। চোখমুখ রাঙিয়ে তীব্র কণ্ঠে গর্জে উঠলেন শশী ভূষণ,-"তোমারে আল্‌বাত মাইনতে হইব! বাবলুই আমাগো একমাত্রর সন্তান। অড়ে তোমারেই মানুষ করতে হইব!"

কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন,-"হায়রে কপাল আমার! কেম্নে বুঝাই অড়ে!"

স্বামীর অস্বাভাবিক মুখায়ব লক্ষ্য করে নরম হয়ে পড়ে গৌরী রানি। গলার আওয়াজ ভারি হয়ে আসে। কিন্তু চোখেমুখে আকুতি মিনতির ছাপ প্রকট। একজন বিবাহিতা স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার থেকে সে কখনোই বঞ্চিত হতে পারে না! এ অন্যায়, অবিচার! আপন সন্তানের জননী হওয়াই জগতে প্রতিটি নারীর একমাত্র কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। জীবনের স্বার্থকতা, পরিপূর্ণতা। আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ীত করতেই গৌরী রানি হঠাৎ প্রতিবাদের সুরে বলে ওঠে,-"ওগো না, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি! পরাণ থাকতে এ আমি কক্ষনো হইতে দিমু না! এ হইতে পারে না! আমি সক্ষম, গর্ভে ধারণ কইর‍্যা আমি আমার সন্তানের মা হইতে চাই! দোহাই তোমার, আমারে তুমি বঞ্চিত কইরো না!"

স্ত্রীর কাতর অভিযোগে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন শশী ভূষণ। চকিতে মনে পড়ে যায়, ভাগ্যবিড়ম্বণার সেই দিনটির কথা। যেদিন দ্বিতীয় সন্তান লাভের প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণে মর্মাহত হয়ে ছিলেন শশী ভূষণ। বিপদ সংকেতের আশঙ্কায় সেদিন একেবারে যমে মানুষে টানাটানি। যার বিনিময়ে প্রচুর রক্তক্ষয় হয়েছিল গৌরী রানির। যেকথা আজও ওর অজানা। শুধু কি তাই, বুকের পাঁজরখানা ভেঙ্গে চৌচির করে দিয়েছিল। যে অপরিসীম যন্ত্রণা নীরবে নিঃভৃতে একেলা শশী ভূষণকেই সইতে হয়েছিল, তা ঘূণাক্ষরেও গৌরী রানিকে কখনো জানতে দেয় নি। মনে মনে নিজে অসন্তুষ্ট হলেও চোখেমুখে ক্ষোভ, দুঃখ এবং অনুশোচনার কোনো চিহ্নই তার ছিল না। নিজের অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে বুকের কষ্টগুলিকে হাসি মুখেই গ্রহণ করেছিল, শুধুমাত্র স্ত্রীর মুখ চেয়ে। ও'কি জানে সেখবর? জানতেও তো চায় নি কোনদিন! আবেগ-অনুভূতি কিছুই কি নেই ওর অন্তরে?

মানসিক বিভ্রান্তিতে হৃদয়-মন-প্রাণ সারাশরীর বিষন্নতায় ছেয়ে যায় শশী ভূষণের। চেয়েছিলেন গোপন করে রাখতে। কিন্তু পারলেন না। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আলমিরার ড্রয়ারটা একটানে খুলে মেডিক্যাল্ রিপোর্টের কাগজটা বের করে তীব্র গলায় বলে উঠলেন, -"এই দ্যাখো, কি লিখছে ডাক্তারে, দ্যাখো! মনে কষ্ট পাইবা, তাই এদ্দিন কই নাই! আমার কি ইচ্ছা হয় না ছোট গিন্নী? আমারও কি ইচ্ছা হয় না, তোমার কোলে একটি ছোট্টশিশু জন্ম গ্রহণ করুক! আমি স্বার্থপর নই ছোট গিন্নী! আমারে ভুল বুইঝ না!"

গৌরী রানি সেকেলে মহিলা। সংস্কারপ্রবণ মন-মানসিকতা। কিন্তু সে যে নিজেই অক্ষম, নিজের রক্তে মাংসে গড়া সন্তানের মা সে যে কোনদিনও হতে পারবে না, তা বুঝতে একটুও দেরী হলো না। যা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারে নি। সন্তান ধারণের ক্ষমতা গৌরী রানির নেই। এতবড় দুঃখ সে কোথায় রাখবে! কেমন করে সইবে!

একটা শব্দও আর উচ্চারণ হয় না গৌরী রানির। রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠস্বর। শোকে দুঃখে হতাশায় পাথরের মতো শক্ত হয়ে ধপাস্ করে বসে পড়ে বিছানায়।

একেই বলে বরাত। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! কত আশা ছিল, কত স্বপ্ন ছিল জীবনে। কিছুই পূরণ হলো না। সব সাধ-আহাল্লাদ নিমেষেই ভেসতে গেল গৌরী রানির। অথচ এতকাল স্বামী শশী ভূষণকেই মিথ্যে ভুল বুঝে কত আঘাত করেছে। কত মনে কষ্ট দিয়েছে। অথচ কখনো কোনো অভিযোগ করে নি, অসন্তুষ্ট হয় নি।

আজ নিজেকেই একমাত্র অপরাধী বলে মনে হয় গৌরী রানির। অনুতাপ অনুশোচনায় পাষাণ হৃদয়টা গলে একেবারে নরম হয়ে যায়। লজ্জায় অপমানে শাড়ির আঁচলে মুখ লুকায়। অশ্রুকণায় চোখদু'টো ছল্ছল্ করে ওঠে। এক সময় সশব্দে ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে কেঁদে ওঠে।

শশী ভূষণ সন্নিকটে এগিয়ে আসে। শান্তনা দিয়ে বলে,-"তুমি কান্দ্ ক্যান ছোট গিন্নী? দোষ তো আমারই! আগে কইতাম, তাহলে পোলাটারে কক্ষনো আঘাত করতা না! মাইত্যা না! যাউগ্ গিয়া সেকথা! যা হইবার ছিল, তা তো হইয়াই গ্যাছে! পোলা বোধহয় ঘুমায় পড়ছে, কাল সক্কাল হইলেই অড়ে ডাইক্যা তোলবা। আদর করবা!"

শূন্যতাবোধে বুকের ভিতরটা এতক্ষণ খাঁ খাঁ করছিল গৌরী রানির। হঠাৎ কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। অনুভব করে, মমতাময়ী মায়ের স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসার এক মধুর আবেশ। স্পর্শ করে হৃদয়কে। জাগ্রত হয়, অদ্ভুদ এক চেতনা, এক অভিনব অনুভূতি। যে অনুভূতি দিয়ে গৌরী রানি আজ নিজেকেই প্রশ্ন করে,-মা হারা একটি ছোট্ট শিশুকে দীর্ঘ নয় বৎসর যাবৎ কোলে পিঠে করে যাকে বড় করেছে, যে মায়ের হাত ধরে ছোট্টশিশু চলতে শিখেছে, কথা বলতে শিখেছে, সে তো সেই মায়েরই সন্তান! আজ কেন সে তার মা হতে পারবে না? সে কেনইবা মায়ের আদর-স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে? তাকে অবহেলিত হতে হবে! বাবলুই রায়চৌধূরী পরিবাবের একমাত্র উত্তরাধিকারী! বংশের প্রতীক! বাবলুই গৌরী রানির একমাত্র সন্তান!

হঠাৎ দু'চোখ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যায় গৌরী রানির। এতকাল নির্দয় নিষ্ঠুরের মতো বাবলুকে কত আঘাত করেছে। কত মারধোর করেছে। ওকে কোনদিনও আদর করে নি, ভালোবাসে নি।

হঠাৎ মনে পড়ে, সন্ধ্যে থেকে বাবলুর আজ কিছুই খাওয়া হয় নি। -"আহারে, সোনা আমার, বাছা আমার! পোলাটা অনাহারেই বোধহয় ঘুমায় পড়ছে!"

আর ভাবতে পারছে না গৌরী রানি। আবেগে আপ্লুত হয়ে ক্রমশই যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। হাত-পা সারাশরীর কেমন অসাড় লাগছে। কি করবে দিশা খুঁজে পায় না। হঠাৎ উন্মাদের মতো চাপা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বারান্দায়।-"আমার বাবলু, সোনা আমার, লক্ষী আমার! আয় বাবা উঠ্! ভাত খাবি আয়!"

কিন্তু বারান্দায় বেরিয়েই থমকে দাঁড়ায় গৌরী রানি। দ্যাখে, অভিমানে গাল ফুলিয়ে জানালার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। চোখমুখ বিষন্নতায় ছেয়ে গিয়েছে। বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল গৌরী রানির। বড্ড মায়া হয়। আর তৎক্ষণাৎ নিঃসন্তান মায়ের শূন্য বুক জুড়ে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে মাতৃত্বে ভরে ওঠে। অনুভব করে, নারীর অস্তিত্ব। নারীর জীবনের চরম সার্থকতা, পরিপূর্ণতা এবং মাতৃস্নেহের দৃঢ় বন্ধন শক্তি। যে বন্ধন শক্তির প্রভাবে গৌরী রানি আজ অনুভব করে, সব কিছু হারিয়েও যেন সবই ফিরে পেয়েছে সে। সেই সঙ্গে মুছে যায়, মনের মণিকোটায় জমে থাকা সমস্ত গ্লানি। আজ যেন বাবলুকে নতুন করে আবিস্কার করে। চেয়ে থাকে ব্যাকুল নয়নে। যেন কতকাল ওকে দ্যাখেনি। ধৈর্য্য ধরে না। আবেগের বশীভূত হয়ে দুহাত প্রসারিত করে দেয় গৌরী রানি। মমতা মাখানো মিষ্টি হাসি কাঁন্নার সুরে বলে ওঠে,-" আয় বাবা আয়! আমার বুকে আয়! তড়ে আর কক্ষনো মারুম না!"
বলেই কাছে এগিয়ে আসে। কিন্তু ছুটে পালায় বাবলু। বলে,-"না, তুমি আমার মা নও! তোমার কোনো কথা আমি শুনবো না।"

ততক্ষণে দৌড়ে এসে বাবলুকে খপ্ করে ধরে ফেলে শশী ভূষণ। বলে-"ছিঃ বাবা, ও কথা কইতে নাই! মায়ের কথা শুনতে হয়! যা বাব যা! মায়ে ডাকে!"

অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকেন শশী ভূষণ। দেখলেন, একটুও অবাধ্য হলো না বাবলু। গুটি গুটি পায়ে কিছুটা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ায়। সাশ্রু নয়নে গৌরী রানি বলল,-"আয় বাবা, আমার বুকে আয়! এই অভাগিনী মায়ের বুকখানা যে কতকাল শূন্য হয়ে আছে বাবা, আমার  কথা শোন!"

নাবালক ছেলে বাবলু। তৎক্ষণাৎই দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের কোলে। অপ্রত্যাশিত অব্যক্ত আনন্দ-বেদনার সংমিশ্রণে সজোড়ে কেঁদে ওঠে মায়ে-পুতে দু'জনেই। স্নেহাস্পদে বাবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওর কপালে গালে চুম্বনে চুম্বনে মাতৃস্নেহে ভরিয়ে দেয় গৌরী রানি।

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন শশী ভূষণ। জানালা দিয়ে অন্ধকার রাতের গ্রহ-তারা-নক্ষত্রে ভরা ঝলমলে আকাশের পানে একপলক চেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরোন্টো প্রবাসী লেখিকা ও সঙ্গীত শিল্পী।

jbarua1126@gmail.com